কৃষি

ফসল (২০০৯-২০১২)

- সরকারের কৃষি-বান্ধব কার্যক্রমের ফলে দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।
- দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভোগী জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- মোট চাল উৎপাদন ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ টন। বিএনপি-জামাত জোটের একই সময়ে উৎপাদন ১০ কোটি ৮ লক্ষ টন। ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন।

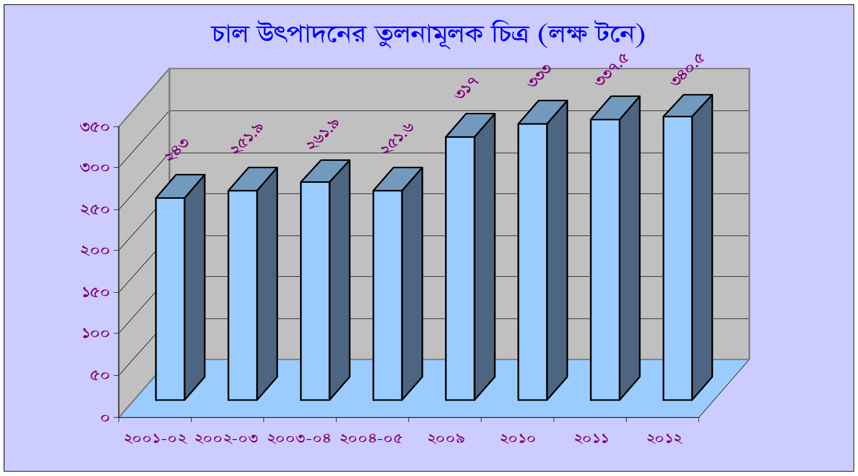

- কৃষককে ২৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান।
- সার, বীজ, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য কৃষকের ক্রয়সীমার মধ্যে নামিয়ে আনা।
- কৃষককে কৃষিকাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভর্তুকির পাশাপাশি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।
- হ্রাসকৃত মূল্যে পর্যাপ্ত সার সময়মতো কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া নিশ্চিতকরণ।
- ৪৫ হাজার ৭২২ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ। প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ।
- কৃষকদের জন্য মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ। ৯৫ লক্ষের বেশি ব্যাংক হিসাব খোলা।
- বাংলাদেশের প্রস্তাবে সার্ক সিড ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানী কর্তৃক পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন। এ সুবিধা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা বাস্তবায়নাধীন।

- উদ্ভিদ বিধ্বংসী ছত্রাকের জীবন রহস্য আবিষ্কার। বিধ্বংসী ছত্রাক সহনশীল বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ এপ্রিল ২০১১ শেরেবাংলানগরস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সার্ক সীড কংগ্রেস ও বীজ মেলার উদ্বোধন শেষে বীজ মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

- সুষম সার ব্যবহার উৎসাহকরণে নন-ইউরিয়া সারের দাম ৩ দফা হ্রাস। প্রতি কেজি টিএসপি সারের দাম ৮০ টাকা থেকে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা এবং ডিএপি ৯০ টাকা থেকে ২৭ টাকায় হ্রাস।
- পাট চাষীদের সুবিধার্থে প্রতি বছর ১৫ লাখ পাট চাষীকে ২০০ টাকা করে সহায়তা প্রদান।
- সার ও সেচে ভর্তুকি ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা থেকে ৭ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত ।
- বিএডিসি'র বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন সামর্থ্য ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি। বীজ হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিটি ২ হাজার টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৫টি নতুন বীজ হিমাগার নির্মাণাধীন।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৪ হাজার ১৩০ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- ৪২টি জেলার ২২৫টি উপজেলায় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্গাচাষীর মধ্যে ৫১২ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ।
- কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৪৮টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় ৫ লক্ষ বর্গাচাষীকে ৫৭৭ কোটি টাকা কৃষিঋণ প্রদান।
- রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলো আলাদাভাবে ১৩ লক্ষ বর্গাচাষীকে ২ হাজার ২৬১ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ।
- ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ৪ শতাংশ রেয়াতী সুদে ঋণ প্রদান।
- শস্য বহুমুখীকরণ এবং উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার ৬১টি উপজেলায় ১৭৪ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ।

- ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ। ১০৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়। আউশ ধান চাষের প্রণোদনা হিসেবে প্রতিবছর প্রায় ৫ লক্ষ কৃষককে বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রদান।
- ভুট্টা চাষের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকে বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রদান।
- হাওর অঞ্চলের বোরো চাষীদের বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রদান।
- সেচের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান।
- সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ হাজার ৬৫৩ কিলোমিটার খাল খনন, ২ হাজার ৪৭৪টি সেচ অবকাঠামো, ১ হাজার ২৩৮ কিলোমিটার সেচ নালা, ৯০টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক, ৭৩ কিলোমিটার মাটির বাঁধ ও ২টি রাবার ডেম নির্মাণ, ২০৩টি গভীর নলকূপ ও ৩৮৯টি টিউবওয়েল স্থাপন, ২ হাজার ৪১৮টি এলএলপি সরবরাহ।
- ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৪১২ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ। ৩ হাজার ২০৬ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।
- ১৮০টি স্যালাইনিটি অবজারভেশন কেন্দ্র স্থাপন।
- কৃষি জমি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্যশস্য উৎপাদন ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টন থেকে ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টনে উন্নীত।
- ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও ভুট্টা চাষের জন্য ২ শতাংশ রেয়াতী সুদে ২৪২ কোটি টাকা ঋণ প্রদান।

সারণী: বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন (লক্ষ টনে)।

ফসলের নাম	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
চাল	৩১৭	৩৩৩	৩৩৭.৫	৩৪০.৫
গম	৮.৫	৯.৭	৯.৭	১০
ভুট্টা	৬.৫	১৩.৭	১৫.৫	১৯.৫
আলু	৬৭.৫	৮৪	৮৩.৩	৮২.১
ডাল	৫.৯	৬.৫	৭.২	৬.৭
পেঁয়াজ	৮.৫	১৪.২	১৫.৯	১৯
পাট (লক্ষ বেল)	৪৯.৪	৮৪.৬	৮০	৭৪.৪

- আলু উৎপাদন ৬৭ লক্ষ টন থেকে ৮৩ লক্ষ টনে উন্নীত।
- পেঁয়াজ, সবজি, মসলা, ফল প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকের কাছে পর্যাপ্ত সার সুলভ মূল্যে সময়মত পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ৮ হাজার ৬৮ জন সার ডিলার ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ২৮ হাজার খুচরা বিক্রেতা নিয়োজিত।

- গুটি ইউরিয়া উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহ প্রদান। জৈব সার ব্যবহারে ৩০০ উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ।
- আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ৩২ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান।
- বরেন্দ্র অঞ্চলে ২ হাজার ২১৮টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৩ হাজার ৯৭৪টি গভীর নলকূপের বিদ্যুতায়ন, ৫ হাজার ৮৫৭ কিলোমিটার সেচ নালা নির্মাণ, ৩২ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও ৪৪ হাজার ৮৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কৃষকের ফসল বাজারজাতকরণ উন্নয়নে উত্তরাঞ্চলে ১৫টি পাইকারী বাজার এবং ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট ও গাবতলীতে কেন্দ্রীয় মার্কেট স্থাপন।
- কৃষকের উৎপাদিত ৩৭ হাজার ২৩১ টন শস্য সংরক্ষণের বিপরীতে ৪৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।
- দেশের ১০টি কৃষি অঞ্চলে ৯৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন। আরো ১৫০টি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রসারে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, পাওয়ার থ্রেসার, মেইজ সেলার, স্প্রেয়ার, উইডার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ২৫ শতাংশ হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ। এতে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়।
- হ্রাসকৃত সুদে কৃষিঋণের পরিমাণ ৯ হাজার ২৮৪ কোটি টাকা থেকে ১৪ হাজার ১৩০ কোটি টাকায় উন্নীত।
- ফসল চাষ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১৪ লক্ষ বর্গাচাষীকে ২ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা বিতরণ।
- জাতীয় কৃষিনীতি চূড়ান্ত।
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্মত বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার ২০১১-১২ অর্থ-বছরে ৯১ হাজার মেট্রিক টন বোরো ধানের বীজ সরবরাহ।
- কৃষককে উৎপাদন সহায়তা হিসেবে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ৬ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি হিসেবে বরাদ্দ প্রদান।

মৎস্য (২০০৯-২০১২)

- মাছের উৎপাদন ২০ শতাংশ বেড়ে ৩২ লক্ষ টনে উন্নীত।
- মোট মাছ ও রেণু পোনা উৎপাদন ১ কোটি ১৯ লক্ষ ২৪ হাজার টন।
- প্রায় ৬ দশমিক ১১ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত।

- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানসম্পন্ন পোনা ও মাছ উৎপাদন, আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, উন্নত নৌ-যান ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, দক্ষ জনবল তৈরী ইত্যাদি নিশ্চিতে ৩৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত।
- মাছের বিভিন্ন জাতের ২২ লক্ষ কেজি রেণু উৎপাদন। ১৪টি হ্যাচারীর কাঠামোগত উন্নয়ন।
- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে মজুদকৃত রেণু পোনা বিলে অবমুক্তির লক্ষ্যে ৪৩৫টি বিল নার্সারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন। বিল নার্সারীর সংখ্যা ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি।
- মৎস্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে মুক্ত জলাশয়ে রুই, কাতলা ইত্যাদিসহ দেশীয় ছোট প্রজাতির ২ হাজার ৩৯১ টন মাছের পোনা অবমুক্তকরণ।
- ৪৩৩টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন।
- ইলিশ মাছের উৎপাদন ও সংগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ১৯ হাজার ৪২ জন জেলেকে প্রশিক্ষন দান ও উপকরণ প্রদান। ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার জেলে পরিবারকে ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় ৫৭ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ।
- জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন। জাটকা নিধনরোধে ২ হাজার ১৬৬টি অভিযান পরিচালনা।
- চিংড়ী খামারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৯০ হাজারে উন্নীত। অর্গানিক চিংড়ী খামার স্থাপিত। উৎপাদন বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নে চিংড়ী খামারগুলোতে আধুনিক ও নিরাপদ উৎপাদন সামগ্রী নিশ্চিতকরণ। ৯ লক্ষ ২৪ হাজার টন চিংড়ী উৎপাদিত।
- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রলারের সংখ্যা ১৪৫টি থেকে ১৮৬টি'তে উন্নীত।
- ১ হাজার ১০১টি নতুন নৌ-যানের লাইসেন্স প্রদান। ৩ হাজার ৬০৪টি লাইসেন্স নবায়ন।
- প্রকৃত জেলেদেরকে পরিচয়পত্র প্রদান।
- মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণে গুড এ্যাকুয়া কালচার প্রাকটিস এবং কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স প্রোগ্রাম বিষয়ে মৎস্য খামারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- হ্যাসাপ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ী রপ্তানি নিশ্চিতকরণ।
- বাগেরহাট ও চট্টগ্রামে ২টি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরী স্থাপন। ঢাকা ল্যাবরেটরীর মান উন্নয়ন। সাভারে একটি আন্তর্জাতিক মানের রেফারেন্স ল্যাবরেটরী নির্মাণাধীন।
- মৎস্য গবেষণা উন্নয়নে ৪৮টি গবেষণা কার্যক্রম গৃহীত।
- কার্প, তেলাপিয়া, থাই কার্প ও নুনা টেংরার উন্নত জেনিটিক জাত উদ্ভাবন।
- মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২ হাজার ৬০০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
- ১৬ হাজার ১৮৩টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও অন্যান্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- নিরাপদ মাছ ও মৎস্যজাত পণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন প্রণয়ন।

- কৌলিতাত্ত্বিক গুণাবলী সম্পন্ন পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য হ্যাচারী আইন প্রণয়ন।
- প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন। মুক্ত জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছের বিলুপ্তি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি। উপকূলীয় অঞ্চলে সমন্বিত চিংড়ী চাষ, খাঁচায় ও পেন এ মাছ চাষ সম্প্রসারণ।
- মৎস্য উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- হালদা নদীর প্রাকৃতিক প্রজনন মৎস্য ক্ষেত্র উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ। হালদা নদীতে প্রায় ৪০ কিলোমিটার এলাকাকে অভয়াশ্রম ঘোষণা।
- আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক ৭টি হ্যাচারি স্থাপন ও সংস্কার।
- ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদাকরণ।
- হালদা পাড়ের মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ ও ত্রাণ বিতরণ।
- বঙ্গভবনে মুক্তা চাষের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন। পাঁচ রঙের প্রায় ১০০ মিলিগ্রাম মুক্তা উৎপাদন।
- ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন সুবিধা স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ।
- যাত্রাবাড়ীতে ৮৮টি মৎস্য আড়ৎ ও ১৩২ কক্ষবিশিষ্ট একটি ছয় তলা ভবন নির্মাণ।
- দেশের মোট ১৫টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার জেলে পরিবারকে ভিজিএফ কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান।
- অমৌসুমে দরিদ্র জেলেদের প্রতি মাসে পরিবার প্রতি ৩০ কেজি হারে বছরে চার মাসে সর্বমোট ২২ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৬৮ মেট্রিক টন চাল প্রদান।
- জাটকা নিধন রোধকল্পে দক্ষিণাঞ্চলের ৫টি জেলার ২৬টি উপজেলায় দরিদ্র জেলেদের মধ্যে ১ হাজার ২৯১ টন চাল বিতরণ। কাপ্তাই, হালদা ও টাঙ্গুয়া হাওরের জেলেদের জন্য ৭৬৫ টন চাল বিতরণ।

প্রাণিসম্পদ (২০০৯-২০১২)

- প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রাণিসম্পদ থেকে যোগান।
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর টিকা উৎপাদন কার্যক্রমকে আধুনিকীকরণ। ১৯ প্রকার টিকা উৎপাদন। গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম গৃহীত।
- আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ খাতে মোট ৯ লক্ষ ৫২ হাজার বেকার যুবক-যুবতী, অসহায় কর্মক্ষম বিধবা ও বয়স্কদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মানবদেহে সংক্রমণযোগ্য গবাদি পশু ও পাখির রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ।

- ঢাকা চিড়িয়াখানাকে বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করার কার্যক্রম গ্রহণ।
- বিভিন্ন প্রজাতির ২০টি প্রাণী ও ১৫৩টি পাখি ক্রয়। আরো ২০০টি নতুন প্রাণী ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেশে প্রথমবারের মত মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাত উদ্ভাবনের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, এনথ্রাক্স, ক্ষুরারোগ ইত্যাদির প্রবেশ রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সীমান্ত জেলাসমূহে ২৪টি স্থানে কোয়ারেনটাইন স্টেশন স্থাপন।
- প্রাণিস্বাস্থ্যের উন্নয়ন। পশুস্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ। প্রাণিরোগ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ।
- গবাদিপশু, হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ, জাত উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত সেবামূলক কাজের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর মৃত্যুহার হ্রাস, খামারিদের কাছে আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ৮১ উপজেলায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- ডেইরী শিল্পের উন্নয়ন ও গবেষণা জোরদার। ডেইরী শিল্প স্থাপন।
- বার্ষিক দুধ উৎপাদন ২২ লক্ষ টন থেকে ৩৩ লক্ষ টনে উন্নীত। মোট উৎপাদন ১ কোটি ১৬ লক্ষ টন।
- বার্ষিক মাংস উৎপাদন ২০ লক্ষ টন থেকে ২৭ লক্ষ টনে উন্নীত। মোট উৎপাদন ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার মেট্রিক টন।
- ডিমের উৎপাদন ৪৭০ কোটি থেকে ৬০০ কোটিতে উন্নীত। মোট উৎপাদন ২ হাজার ৪৪৭ কোটি।
- ৪ বছরে দুধ, মাংস ও ডিমের মাথাপিছু প্রাপ্যতা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি।
- প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী বিষয়ক সরকারী, বেসরকারী এবং যৌথ কারবারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- দুগ্ধ ও দুগ্ধশিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ডেইরী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন।
- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা জোরদার। গবেষণা ইনস্টিটিউটে বায়োটেকনোলজীসহ ২টি গবেষণা বিভাগ চালু। বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে ১৩৩টি গবেষণা অব্যাহত।
- খামারী পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৮টি প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- বছরে ২৮০-২৯৫টি ডিম পাড়তে সক্ষম, সাশ্রয়ী, দেশী আবহাওয়ায় টেকসই, রোগবালাই প্রতিরোধে সক্ষম, লালন-পালন তুলনামূলকভাবে সহজ 'শুভ্রা' নামক বাণিজ্যিক লেয়ার বা ডিম পাড়া মুরগীর জাত উদ্ভাবন।

- গলাছিলা মুরগীর জাত উন্নয়ন। রেড চিটাগাং ক্যাটেল জাত উন্নয়ন। উচ্চ ফলনশীল ঘাসের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ।
- গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের কভারেজ ৩৬ শতাংশে উন্নীত। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- গবাদিপশুর জন্য ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডোজ এবং হাঁস-মুরগির জন্য ৭৩ কোটি ২২ লক্ষ ডোজ টিকা উৎপাদন।
- প্রাণিসম্পদ প্রতিপালনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৩৫ লক্ষ খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৯১টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ১টি এফডিআইএল, ১টি ভেটেরিনারী কলেজ, ৩০০টি ইউনিয়ন এআইসেড, ৬৭০টি ইউনিয়ন পরামর্শ কেন্দ্র, ১৩টি হাঁসের হ্যাচারী, ১টি মহিষ প্রজনন খামার, ১টি ভেড়া উন্নয়ন খামার ও ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।
- ছাগল ও ভেড়ার মারাত্মক পিপিআর রোগ দমনে থার্মোস্টেবল ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে মুরগীর বাচ্চা পালনের জন্য নন-ইলেকট্রিক চিক ব্রুডার উদ্ভাবন।
- গবাদিপশুর খাদ্যে খনিজ পদার্থের অভাব পূরণ করার জন্য 'মিনামিক্স' ফিড এডিটিভ প্রযুক্তি এবং ভুট্টার দানা সংগ্রহের পর অব্যবহৃত ভুট্টা গাছ প্রক্রিয়াজাত করে প্রয়োজনীয় মিনারেল মিশিয়ে 'কর্ন-স্ট্র প্যালেট' নামক গো খাদ্য উদ্ভাবন।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধে সহায়ক ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাব স্থাপন।
- এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও এনথ্রাক্স রোগ নিয়ন্ত্রণে সাফল্য অর্জন।
- রোগে ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের ২৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ এবং ২ হাজার ৩৯০ জন ক্ষুদ্র খামারী ও ১৮ হাজার পারিবারিক খামারীকে পুনর্বাসন।
- সার্ক দেশসমূহের পিপিআর রোগের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সার্ক অঞ্চলের রেফারেন্স ল্যাব স্থাপন।
- ডিএনএ এক্সট্রাকশন কিট উদ্ভাবন।
- তাপ-সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাক্সিন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- পোলট্রি খামারীদের জন্য "জীব-নিরাপত্তা" মডেল উদ্ভাবন।
- পোনা মাছ নিধন রোধকল্পে ১ সেন্টিমিটার অথবা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের মেশ-বিশিষ্ট জালের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ।

বন (২০০৯-২০১২)

- সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ১৮(ক) এ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত।
- বন, বন্যপ্রাণী ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী বনজ দ্রব্য পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, করাতকল লাইসেন্স বিধিমালা, বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং সামাজিক বনায়ন বিধিমালা সংশোধন।
- বন আইন, ১৯২৭ সংশোধন এবং বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৮ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশে উন্নীত।
- ১ লক্ষ ৩৮ হাজার হেক্টর এলাকা সংরক্ষিত বন ঘোষণা।
- ৫৮ হাজার ৯৩৮ হেক্টর ব্লক বাগান সৃজন। ৯ হাজার ২৯৭ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন।
- গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক এবং চট্টগ্রামে শেখ রাসেল এভিয়ারি এণ্ড ইকোপার্ক নির্মাণাধীন।
- বন রক্ষার্থে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪৩ লক্ষ টাকা প্রদান।
- চিত্রা হরিণ লালন-পালন নীতিমালা প্রণয়ন। বাংলাদেশ বায়োসেফটি রুলস্ প্রণয়ন।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অবদান রাখার জন্য প্রতিবছর তিনটি শ্রেণীতে “বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন” পুরস্কার প্রদান।
- ভারতের সঙ্গে সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন।
- সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার রক্ষার জন্য টাইগার ২০০৯-২০১৭ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন। বাঘ সংরক্ষণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ঢাকা, খুলনা ও সাতক্ষীরায় বিশ্ব বাঘ দিবস উদযাপন।
- সুন্দরবন সংলগ্ন ৭৬টি গ্রামে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে “ভিলেজ ফোরাম” গঠন। সংরক্ষিত বন এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলন।
- বাংলাদেশ বন সেক্টর ২০১২ সালের ইকুয়েটর পুরস্কার, ওয়াঙ্গারী মাথাই পুরস্কার এবং আর্থ কেয়ার পুরস্কার অর্জন।
- বাংলাদেশ বন বিভাগ ও ইউএস ফরেস্ট সার্ভিসের যৌথ জরিপে সুন্দরবনের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত গ্রোয়িং স্টক ও রিজেনারেশন বৃদ্ধি।
- বিএনপি-জামাত জোটের সময় বছরে বৃক্ষচারা উত্তোলনের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৪ কোটি। বর্তমান সরকারের সময় বছরে ১০ কোটির অধিক বৃক্ষচারা উত্তোলন।

- স্থানীয় জনগণকে সরকারী বনে বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান। দেশের সকল পতিত জমিকে বনায়নের আওতায় আনা। সামাজিক বনায়নকে উৎসাহ প্রদান। দারিদ্র্য বিমোচনে গতিসঞ্চার।
- সামাজিক বনায়নের পরিপক্ক গাছ আহরণের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৩৩৩ জন উপকারভোগীকে ১৮৫ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান।
- ১৮৫ কোটি টাকা সরকারী রাজস্ব জমা।
- সামাজিক বনায়নের আবর্তকাল উত্তীর্ণ গাছ আহরণ করে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ঘনফুট কাঠ, ১ কোটি ৭০ লক্ষ ঘনফুট জ্বালানি এবং ৪৪ লক্ষ খুঁটি উৎপাদন।
- ১০ হাজার কিলোমিটার সড়ক ও বাঁধ এবং ২২ হাজার হেক্টর এলাকায় পুনঃবনায়ন।
- পুনঃবনায়নের জন্য প্রায় ৪০ কোটি টাকার ট্রি ফার্মিং ফান্ড গঠন।
- ৬৮ হাজার ২২৩ একর সংরক্ষিত বন ঘোষণার কাজ সম্পন্ন।
- উপকূলীয় বনায়ন প্রক্রিয়ায় বঙ্গোপসাগর থেকে ১২০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে সংযোজন। ১ লক্ষ ১০ হাজার ৬৫৮ একর চরভূমি বনায়নের মাধ্যমে শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর। উপকূলীয় চরাঞ্চলে ১৮ লক্ষ হেক্টর নতুন জেগে ওঠা চরে বন সৃজন।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য দেশে নতুন করে আরও ৭টি জাতীয় উদ্যান ও ৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষিত এলাকা ২১ হাজার ৫১৮ হেক্টর বৃদ্ধি।
- বর্তমানে সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ২ লক্ষ ৬৫ হাজার হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ১ দশমিক ৮ শতাংশ।
- সংরক্ষিত এলাকায় গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, রাঙ্গুনিয়ায় শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারী এ্যান্ড ইকোপার্ক, বৃহত্তর যশোর জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন, বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প গ্রহণ।
- রাবার নীতি প্রণয়ন। জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাবার বাগান সৃজন ৩২ হাজার ৬৩৫ একরে উন্নীত।
- গবেষণার মাধ্যমে ৬টি বৃক্ষ প্রজাতির কাঠের ভৌতিক ও যান্ত্রিক গুণাবলী নির্ধারণ। নার্সারীর ২০টি পোকা-মাকড় রোগ বালাই সনাক্তকরণ ও দমন কৌশল উদ্ভাবন। ১৫টি ঔষধী গাছের পোকা-মাকড় রোগ বালাই সনাক্তকরণ ও দমন কৌশল উদ্ভাবন। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ভূমি ক্ষয়রোধের প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়ামে ১৪টি জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৩ হাজার ৪৭৯টি উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ। প্রজাতি সনাক্তকরণ। বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিবারসহ তথ্য সংরক্ষণ।
- পরিবেশ সুরক্ষা, ভূমি ক্ষয় ও ভাঙ্গনরোধসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

- বনজ সম্পদ উন্নয়নে ৫০টিরও অধিক লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন। এসব প্রযুক্তি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষক পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে বনজ বৃক্ষের উৎপাদন বৃদ্ধি।
- বছরে ৩৫ লক্ষ দর্শনার্থী বনাঞ্চল ভ্রমণ।

খাদ্য ও পুষ্টি (২০০৯-২০১২)

- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে আপদকালীন মজুদ বৃদ্ধি। নতুন গুদাম নির্মাণ। বর্তমান গুদামগুলো মেরামতকরণ। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ অব্যাহত।
- আমন ও বোরো মৌসুমে মোট ৪১ লক্ষ ৯ হাজার টন চাল সংগৃহীত। ১ লক্ষ ৮১ হাজার টন গম সংগৃহীত।
- নিম্নআয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সারা বছর কর্মসূচী বাস্তবায়ন। খাদ্যশস্যের মজুদ ১৫ লক্ষ টনে উন্নীত।
- অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আমন মৌসুমে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাল ক্রয়। বোরো মৌসুমে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ক্রয়।
- দেশে আশানুরূপ চাল উৎপাদিত হওয়ায় চাল আমদানি ব্যাপকভাবে হ্রাস।
- খাদ্য নিরাপত্তা নীতিসমূহকে সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন নীতির সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ।
- বিভিন্ন খাতের নীতি-কৌশল, কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের সুযোগ বৃদ্ধি।
- আমন ও বোরো ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত।
- গম ভাঙ্গিয়ে ফলিত আটা বিক্রয়ের একটি নতুন কার্যক্রম গ্রহণ। ২ লক্ষ ৬০ হাজার ১১৩ টন গম বরাদ্দপূর্বক আটা ও ময়দা কলে গম ভাঙ্গিয়ে ফলিত আটা নির্ধারিত ডিলারের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে বিক্রয়।
- ওএমএস এর আওতায় হ্রাসকৃত মূল্যে খোলা বাজারে ১৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টন চাল বিক্রি।
- ওএমএস কার্যক্রমের চাল ক্রয়ের সুবিধা গ্রহণে অপারগ ব্যক্তি ও পরিবারকে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের সুবিধা প্রদান।

- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার মঙ্গা মোকাবেলা। এর আওতায় উত্তরাঞ্চলের মঙ্গাপ্রবণ এলাকা, নদী ভাঙ্গন ও চরাঞ্চলের মৌসুমী বেকারদের ৮০ দিনের কর্মসংস্থানের জন্য ২ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়। ২৭ লক্ষ ৩৬ হাজার লোকের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলার ১৫০টি ইউনিয়নে চর জীবিকায়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন। ২ লক্ষ ৫০ হাজার দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত।
- চর জীবিকায়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে ২য় পর্যায়ে ৭৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে টাঙ্গাইল, পাবনা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার চর এলাকার ৩১টি উপজেলায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত।
- ৮৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের চর, হাওর-বাঁওড়, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা, অতি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল এবং পার্বত্য এলাকার ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের (টিআর) লক্ষ্যে ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৭৩ টন খাদ্যশস্য ও ৩৭৭ কোটি টাকা বিতরণ।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টন খাদ্যশস্য ও ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয়। ২৭ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি। বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসৃজন।
- দুঃস্থ ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় ৩ কোটি ৩৬ লাখ ৮২ হাজার উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে ৭ লক্ষ ২৩ হাজার টন খাদ্যশস্য বিতরণ।
- মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর (জিআর) আওতায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা নগদ, ১ লক্ষ ৫৭ হাজার টন চাল, ৯৩ হাজার বান্ডিল ঢেউটিন, ১২৪ কোটি টাকা গৃহ বাবদ মঞ্জুরী এবং ১০ লক্ষ পিস কম্বল ও ১০ কোটি টাকা বিতরণ।
- "মানুষের সত্তাকে কাজে লাগিয়ে জীবিকায়নের মাধ্যমে আয় নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন" - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ দর্শন বাস্তবায়নে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের সক্ষম সদস্যকে কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক কাজে সম্পৃক্ত করতে "একটি বাড়ী একটি খামার" কর্মসূচী গ্রহণ।
- এ কর্মসূচীর আওতায় গ্রামকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ১ হাজার ৪৯২ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ।
- দুঃস্থ ও নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য সুলভ মূল্য কার্ডের প্রচলন।

- ফেয়ার প্রাইস কার্ডধারী ৭৭ লক্ষ ১ হাজার ৫৫৮টি পরিবারের মধ্যে ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টন চাল বিতরণ। সুলভ মূল্য কার্ডধারীদের একটি ডাটাবেজ তৈরী।
- সরকারী কর্মচারী ও গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের জন্য খাদ্যশস্য বিতরণ কর্মসূচী নতুনভাবে চালু।
- চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, গ্রাম পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে মোট ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৫৮টি পরিবারের নিকট স্বল্পমূল্যে ১ লক্ষ ২ হাজার টন চাল বিক্রয়।
- নিম্নআয়ের সরকারী কর্মচারী এবং শ্রমজীবী গার্মেন্টস কর্মচারীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- সারাদেশে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীগণের একটি তালিকা প্রস্তুত এবং সুবিধাভোগীদের জন্য মূল্য কার্ড সরবরাহ।
- খাদ্যগুদামের ধারণক্ষমতা ১৫ লাখ টন থেকে ২২ লাখ টনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টন ধারণক্ষমতার গুদাম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন। উত্তরাঞ্চলের ১৫টি জেলায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৪০টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ। দেশের অন্যান্য স্থানে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৭০টি গুদাম নির্মাণাধীন। চট্টগ্রামে ৮৪ হাজার টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৯১টি গুদাম নির্মাণাধীন।
- দেশে বিদ্যমান চালকলগুলোতে আধুনিকায়ন এবং উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহার।
- উন্নতমানের চাল প্রস্তুতের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- খাদ্যশস্য রপ্তানিকারক নতুন নতুন দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন ও জরুরী প্রয়োজনে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা সুসংহতকরণ।
- খাদ্য নিরাপত্তা বাড়াতে পাঁচ বছর মেয়াদী "বাংলাদেশ বিনিয়োগ পরিকল্পনা: খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি ও পুষ্টিতে বিনিয়োগের রোডম্যাপ" প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক ১২টি কর্মসূচী চিহ্নিতকরণ।
- ১৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাভুক্তকরণ।
- ২০১২ সালে খাদ্য নিরাপত্তা বিনিয়োগ পরিকল্পনার বাজেট পূর্বে নির্ধারিত ৭৮০ কোটি ডলার থেকে ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৯১০ কোটি ডলার নির্ধারণ। এ বিনিয়োগ পরিকল্পনাভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা ৪০৫টি। ইতোমধ্যে ৫২০ কোটি ডলার বিনিয়োগ।